"বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম"

শ্রীশচীনন্দন বসাক

২য় বর্ষ—বিজ্ঞান।

পৃথিবীর বুকে যেদিন থেকে সৃষ্টির আলো প্রথম এসে প্রকৃতির প্রত্যেকটা অণু পরমাণুকে সঞ্জীবিত ক'রে তুলেছে,—যেদিন থেকে মানুষ সেই আলোয় তার পারিপার্শ্বিক সকল জিনিষকে দেখে বুঝতে শিখেছে—ঠিক সেদিন থেকেই আরম্ভ কোরে বিজ্ঞান আর ধর্ম্মের মধ্যে কি যেন এক ভীষণ দ্বন্দ্ব তার প্রলয় মত্ততা নিয়ে তার নগ্ন মূর্ত্তি নিয়ে আজও দেখা দিচ্ছে। সভ্যতা সৃষ্টির সকল প্রকার প্রকরণের অধিকারী হ'য়েও আজ পণ্ডিতপ্রবরগণকে এর একটা পরিপূর্ণ সমাধানের দ্বারে উপস্থিত হ'তে হার মান্‌তে হচ্ছে। কিন্তু এখনও কি বিজ্ঞান আর ধর্ম্মের মধ্যে সন্ধি হবার সময় আসে নি?

এখন আমরা সকলেই বুঝ্‌তে শিখেছি—এই অনাকাঙ্ক্ষিত বিরোধের ভিত্তি ভ্রান্ত ধারণার উপরই। এখন আমরা সকলেই চাই—এই ভ্রান্ত ধারণার নেশাটাকে কাটিয়ে একটা সন্তোষজনক আপোষ ও মীমাংসার ক্ষেত্রে উপনীত হ'তে। বিজ্ঞানের বর্ণনা ও ধর্ম্মের বিশ্লেষণ— এদের মধ্যে যে বিরোধ, সেটা যে প্রকৃতই মানব-প্রকৃতির একটা দুর্ব্বলতা ও মানব সমাজের একটা অকল্যাণ -তা মেনে নিতেই হ'বে।

Dr. Trotter বলছেন,—'A science is a body of knowledge derived from experience of its material and co-ordinated so that it shall be useful in forecasting and, if possible, directing the future behaviour of that material.' কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ঠিক বাস্তবিক অভিজ্ঞতার অর্জ্জিত জ্ঞান নয়। সুতরাং Dr. Trotter এর বিজ্ঞান ব্যাখ্যার কিছু সংশোধন দরকার। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমরা সম্যক্ পর্য্যবেক্ষণ, পর্য্যালোচনা ও পরিমাপ থেকেই পাই। তাই Thomson বলেছেন,—'Science includes all systematised, verifiable and communicable knowledge reached by reflection on the impersonal date of observation and experiment.' সুতরাং সংক্ষেপে আমরা বল্‌তে পারি -জগতের একটা বিশিষ্ট বিভাগের সর্ব্ব সামঞ্জস্য-সমন্বিত সম্যক অনুশীলনই বিজ্ঞান! সুবিধা অনুসারেই পৃথিবীটাকে কয়েকটা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—এবং তার প্রত্যেকটা এক একটা বিশেষ বিজ্ঞানের সাহায্যেই পরিচালিত হচ্ছে।

সাম্‌নে থেকেও যে সকল সম্ভাব্যতা আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না; বিজ্ঞানেই তা'কে ধরা পড়'তে বাধ্য করায়। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হ'লো কতকগুলো বিধি-নিয়মের (Laws) আবিষ্কার করা—যার ফলে আমরা বল্‌তে পারবো—'যদি এই হয়, তবে এই হ'বে।' বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করাই বিজ্ঞানের কাজ—এই ছিল আগেকার যুগের বিজ্ঞানের অসংশ্লিষ্ট, অস্পষ্ট মতবাদ। কিন্তু দিনের পর দিন পৃথিবীর রং পরিবর্ত্তনের মাঝ দিয়ে যতই পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে—ততই এই সকল মতবাদের রূপান্তর দেখা দিচ্ছে। এখন আমাদের বর্ত্তমান যুগের মতবাদের অভিনবত্ব নিয়ে বল্‌বো—বিজ্ঞান কেবল বর্ণনামূলক বিজ্ঞান কেবল পর্য্যবেক্ষণ-সূত্র বিবরণীই দেয়। এখন স্পষ্টই দেখা যাবে বর্ণনামূলক বিজ্ঞানের ও বিশ্লেষণ-মূলক ধর্ম্মের কোনও রকম বিরোধের কথা উঠ্‌তেই পারে না—এদের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আমাদের জগৎ যেখানে দ্রুতপর্য্যায়ে পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তের মধ্যে দিয়ে চলেছে সেখানে এই বিজ্ঞানের একটা বিশিষ্ট ইতিহাস ও উৎপত্তি স্থল থাক্‌তেই হ'বে। তা' না হ'লে হয়তো বিজ্ঞানের প্রসার এমন কি তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অনেককে সন্দিহান হ'তে দেখা যাবে।

ঠিক ভাবে বল্‌তে গেলে, বিজ্ঞান কেবল বল্‌বে—এই জিনিষের এই ক্ষেত্রে এই হয় বা হ'তে পারে; হয়তো তার অনুশাসনেরও নির্দ্দেশ দেবে। বিজ্ঞান কেবল দেখিয়ে দেবে এই জিনিষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি কি রূপান্তর পাওয়া যাবে, কি রকমে এটা হয়, কোথা থেকে এটা আসে, কি ভাবে এটা এরকম হলো, ইত্যাদি। কিন্তু এই পর্য্যন্তই। কোনও কিছুর অন্তর্নিহিত অর্থ বা চরম উদ্দেশ্যের কথা জিজ্ঞাসা করলেই বিজ্ঞান থাক্‌বে নীরব নির্ব্বাক হ'য়ে।

অযোগ্য, অদূরদর্শী সমালোচকেরা হয়ত বল্‌বেন—বিজ্ঞান সকল বিষয়েরই পরিপূর্ণ বর্ণনা দেয়। কিন্তু একথা বল্‌লে ভুল হ'বে—কেননা অনেক ক্ষেত্রে এরূপ পরিপূর্ণতা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। ইন্দ্রিয়-অনুভূতিও পর্য্যবেক্ষণের ফলে যতখানি পরিপূর্ণতায় উপস্থিত হওয়া যায় কেবল ততখানিই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। প্রথমতঃ, বিজ্ঞান জীবন মনের তত্ত্ব নির্দ্দেশ ক'র্‌তে পার্‌বে না। দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞান প্রায় অনেক বিষয়েরই সৃষ্টি ও উৎপত্তি অস্পষ্ট অংসংলগ্ন যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করবে আবার কতকগুলোর সম্বন্ধে হয়ত কিছুই বল্‌তে পারবে না। এখানেই বিজ্ঞানের ক্ষমতা ও প্রসারের সীমা নির্দ্দেশ পাব, এবং ঠিক এখানেই বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধের কথা ভাব্‌তে হ'বে।

বিজ্ঞানের আলোচনা যত সহজ ব'লে মনে হ'বে, ধর্ম্মের আলোচনা ঠিক সে রকম ব'লে মনে হ'বে না। কেননা বিজ্ঞান যেখানে প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তিত্ব শূন্য, ধর্ম্ম সেখানে হ'য়ে পড়ে ব্যক্তিগত; ধর্ম্ম বাস্তবের আকৃতি ও দৃষ্টির সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত হ'য়ে যায়; কিন্তু সে আস্বাদ বিজ্ঞানের নির্দ্দেশের বাইরে। ধর্ম্মের একটা যথার্থ সূত্র নির্দ্ধারণ

করা বড়ই কঠিন। তাই Professor Caird বলেছেন—'Religion is difficult to define because it is beyond science, because it is essentially personal, because it has had a long evolution and because it has practical emotional as well as intellectual aspects.', দেশকাল পাত্র ভেদে অভিব্যক্তির ক্রমপর্য্যায়ে ধর্ম্ম বিভিন্ন আকার ও বিভিন্ন প্রসার নিয়ে দেখা দেয়; তাই আমরা ধর্ম্মকে স্থির স্থায়ী সূত্রে বেঁধে নিতে পারি না। বাস্তবতার যে অতীন্দ্রিয় বিশ্বাসকে অভিজ্ঞতার মূল্য দিয়ে ধরতে পারিনা ধর্ম্মটা ঠিক তাই। Thomson এর কথায় বলতে হবে—'The essence of Religion in its higher forms includes submission to the divine will, some form of communion with the divine and some vision of God.' কারও মতে বিজ্ঞানেরই হোক, শিল্পকলারই হোক বা নীতি সম্বন্ধীয়ই হোক যে কোনও প্রকার উদ্যম ও উন্মাদনাকেই ধর্ম্ম বলা যায়। গোঁড়ামতে সর্ব্বকর্তৃত্বময় অধিদেবতায় বিশ্বাসকেই ধর্ম্ম বলা হয়; আর তখন ধর্ম্মটা হ'য়ে পড়ে সম্পূর্ণ নীতি সম্বন্ধীয়। আবার Comte ধর্ম্মকে মানবতার গণ্ডীর মধ্যে নিয়ে আসেন, তিনি বীরপূজার সঙ্গে ধর্ম্মের অঙ্গাঙ্গিভাব সমর্থন করেন। কেউ কেউ আবার বলেন ধর্ম্মের অস্তিত্ব ও অনুভূতি কেবল অচীন ও অসীমেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু Martinean বলেছেন; - 'By religion I understand the believer's worship of the supreme mind and will directing the universe and holding moral relations with human life.' এই মতবাদটাই যেন বেশ উদার ও প্রশস্ত বলে মনে হয়।

এখন যদি আমরা ধর্ম্মের তিনটে প্রবেশ দ্বারকে মেনে নিতে পারি তবেই আমাদের ধর্ম্মের আলোচনা আসবে সরল হ'য়ে। ধর্ম্মের প্রথম কার্য্যকরী পথটাকে আমরা মেনে নিতে চাই না—কেননা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দৈব বাধাবিঘ্নকে আমাদের চোখে তুচ্ছ ও হেয় ক'রে তুলেছে কিন্তু যাঁরা কেবল নৈতিক দৃষ্টি নিয়েই জগতে চলেন, তাঁদের কাছে ধর্ম্মের এই প্রথম পথটা রুদ্ধ হ'বার নয়। অনেক সময় আনন্দ ও দুঃখের দুর্দ্দমনীয় উন্মাদনা বা বিভিন্ন রুচির বশবর্ত্তী হয়েই মানুষ ধর্ম্মের দ্বিতীয় পথের সন্ধান পায়। কখনও আবার বিশ্বের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য মানুষের মনে অলক্ষ্যে ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করে,—বিজ্ঞান এ পথের অন্তরায় হ'তে আসে না বা অন্তরায় হ'তে পারেও না। আর যখন সকল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফল ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়, ঠিক তখনই মানুষ পায় ধর্ম্মের তৃতীয় পথের সন্ধান।

বিজ্ঞানের সাম্রাজ্যে দুর্ব্বলতা দেখাবার অভিপ্রায় নিয়ে ভগবান্‌কে সাম্‌নে রাখাটা হ'বে একটা ভ্রমাত্মক যুক্তি। কিন্তু এখনও অসংখ্য বৈজ্ঞানিক সমস্যা অমীমাংসিত রয়েছে। প্রকৃতির মূল রহস্যটা হয়ত চিরদিনই অনুদ্ঘাটিত থেকে যা'বে। আদি অন্তের দার্শনিক বিশ্লেষণ আজও সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে দেয়। আর এখানেই ধর্ম্মকে করতে হ'বে প্রতিষ্ঠা।

Martinean আবার বলেছেন—'Science deals simply with what happens and the way in which it happens, and only where it ends can ethics and theology begin.' যে স্পষ্টই সাক্ষ্য আমরা ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা থেকে পেয়ে থাকি, তা চিরদিনই বলে আসবে,—এমন কতকগুলো স্বাভাবিক অদম্য প্রবৃত্তি আছে যারা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন একটা বিশাল অনির্দ্দিষ্ট রহস্যলোকের নির্দ্দেশ দেবে যেখান থেকে এই অপূর্ব্ব পৃথিবীর সৃষ্টি ও উদ্ভব। মনে হয় সেটা যেন কিছু একটা 'সীমার মাঝে অসীম'।

প্রত্যক্ষবাদীরা কখনই বিজ্ঞানসম্মত ছাড়া অন্য কোনও রকম জ্ঞানের প্রযোজ্যতাকে স্বীকার করে নিতে চাইবে না। কিন্তু যদি এ রকম কোনও অবস্থার উদ্ভব হ'তে না দেওয়া হয়, তাহ'লে দেখা যাবে বহুদর্শী বর্ণনার ও অত্যুত্তম অর্থোদ্ঘাটনের মধ্যে কোনও বৈরীভাব নেই যদিও তাদের মধ্যে বর্ণ ও অভিব্যক্তিগত বৈষম্য থাকতে পারে। তাই আবার Thomsonএর কথা মনে পড়ে যায়—'If Science and religion are 'true to their respective aims, there should not be any opposition between them.' সুতরাং বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম যদি তাহাদের সকল উদ্দেশ্য ও পন্থার পরস্পর সহানুভূতি সম্পন্ন হয়, তবেই জগতের সর্ব্ববিধায়ক মঙ্গল সম্ভব হয়ে উঠবে।

দুর্ল্লভ

শ্রীপঞ্চানন পাল
দ্বিতীয় বর্ষ—বিজ্ঞান বিভাগ।

তোমারে আমি জীবন ভরি
খুঁজিনু মনে মনে ;
কত না সুখে, কত না দুখে
কত মিলন ক্ষণে ;
নবীন নব শিশুর মুখে
হাসির রেখা সনে।